Radio Serial Script No. 45 –
Promoting Green Buildings

গবেষণা, রচনা ও বেতার নাট্যরূপ –
সায়েন্স কমিউনিকেটরস্‌ ফোরাম-এর পক্ষে

সপ্তর্ষি রায় বর্ধন

		চরিত্র
বিশ্বরঞ্জন সেনগুপ্ত	–	বিদ্যালয় অধ্যক্ষ, বয়স ৮০ বছর।
মানসপ্রতিম মাইতি	–	বিদ্যালয় শিক্ষক, বয়স ৩২ বছর।
বাঁশরী বসু	–	বিদ্যালয় শিক্ষিকা, বয়স ২৮ বছর।
সৌম্য	–	ছাত্র
সুজয়	–	ছাত্র
অর্ক	–	ছাত্র
সীমন্তিনী	–	ছাত্রী
সোহিনী	–	ছাত্রী
অমিত মীরচন্দানী	–	ইঞ্জিনিয়র, গুজরাতী, কলকাতায় তিন পুরুষের বাস ও ব্যবসা, কথায় অবাঙ্গালী টান আছে।

(আবাসিক বিদ্যালয়। শহরের বাইরে। মাত্র আট-ন'শো ছাত্র-ছাত্রী। নবম ও দশম শ্রেণী থেকে বাছাই করা ত্রিশ জন ছাত্র-ছাত্রীর দল। একজন শিক্ষক ও একজন শিক্ষিকা মিলে বত্রিশজন। স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বরঞ্জন সেনগুপ্ত। তিনিও এই দলে যাবেন। ছাত্র-ছাত্রীরা তৈরি হয়ে এসে অপেক্ষা করছে।)

মানসপ্রতিম ঃ কি সবাই রেডি?

ছাত্র-ছাত্রীরা ঃ (সমস্বরে) হ্যাঁ, মাসনদা একদম রেডি।

মানসপ্রতিম ঃ আরে তোমাদের বাঁশরীদি কোথায়? তিনি যথারীতি লেট লতিফ।

বাঁশরী ঃ না, মশাই। আমি আপনার আগেই। লেট লতিফ আপনিই।

মানসপ্রতিম ঃ ও বাবা, আপনি তো রেকর্ড করলেন বাঁশরীদি।

বাঁশরী ঃ নিজে এল দেরি করে পাক্কা ...

সৌম্য ঃ পনের মিনিট বাঁশরীদি।

সোহিনী ঃ বললে হবে না মানসদা। বাঁশরীদি অনেকক্ষণ আগেই এসেছেন।

অর্ক ঃ বেশ শীত শীত করছে। একটা সোয়েটার নেব মানসদা?

মানসপ্রতিম ঃ তা নিতে পারো। তাড়াতাড়ি নিয়ে এস। (তারপর সবাইকে উদ্দেশ্য করে) – সবাই শোনো। ঠান্ডার প্রোটেকশনের জন্য একটা কিছু সবাই নিয়েছ তো? না নিয়ে থাকলে পাঁচ মিনিটের মধ্যে নিয়ে এসো। হারি আপ। জলের বোতল নিতে ভুলো না। সাথে নোট বই আর কলম, নোটস্ নিতে হবে প্রত্যেককে। এটা যেন মনে থাকে।

বাঁশরী ঃ ও মশাই আপনাল বড়দাদার খবর কি? তাঁকেই তো দেখা যাচ্ছে না।

মানসপ্রতিম ঃ (মুখে হাতচাপা দিয়ে) দিদিমণি আস্তে। ঐ যে তাঁর ঘরের দরজা। ভেতর থেকে ভ্যাজানো। বাইরে তালা নেই। অর্থাৎ তিনি অন্দরে।

সুজয় ঃ বিশ্বদা তো অনেকক্ষন আগেই এসেছেন। আমি যখন বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম তখনই দেখি বিশ্বদা তালা খুলে ঘরে ঢুকলেন।

মানসপ্রতিম ঃ তবে, তবে। উনি কোন সময় লেটে এসেছেন আমি দেখি নি গত পাঁচ-ছয় বছরে।

বাঁশরী ঃ তা ঠিক। বিশ্বদা এতদিন পড়িয়েছেন যাদবপুরে। অধ্যাপক হিসেবে সব্বার প্রিয় ছিলেন শুনেছি।

(হঠাৎ অধ্যক্ষের ঘরের দরজা খুলে গেল। সবাই চুপ)

মানসপ্রতিম ঃ বিশ্বদা আমরা রেডি।

বিশ্বরঞ্জন ঃ হ্যাঁ, আমিও রেডি। কয়েকটা কাগজ দেখার ছিল। দুটো চিঠি যাবে। আজ সারাদিন তো সময় পাবো না। একটু এগিয়ে রেখে এলাম। তা ছেলে-মেয়ে কম কম লাগছে যেন ...

সৌম্য ঃ মানসদাকে বলে অর্ক, সোহিনী, বিপ্রদাস আরও তিন-চার জন ঘরে গেছে সোয়েটার-টোয়েটার আনতে।

বিশ্বরঞ্জন ঃ ঠিক করেছে। ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। সাবধান থাকাটাই ঠিক। (হঠাৎ বাঁশরীর দিকে তাকিয়ে) – আর বাঁশরীদি যে কিছু নাও নি। ঐ সিলকের শাড়িতে ঠাণ্ডা মানবে তো?

বাঁশরীদি ঃ না বিশ্বদা ঠিক আছে। একটা পাতলা সুতির চাদর নিয়েছি।

বিশ্বরঞ্জন ঃ বেশ বেশ। ভালো কথা, মানস তুমি আজকের বিষয়ে একটু এদের বলে দিয়েছ তো? আমার মনে হয় এতদিন যা বলেছি, তার ওপরেও আজ রওনা হবার আগে একটা ছোট্ট ব্রিফিং থাকা ভালো।

মানসপ্রতিম ঃ ঠিক বিশ্বদা। বাঁশরীদিও বলছিলেন গতকাল এটা। (সামনের দিকে তাকিয়ে) – শোনো, তোমরা ছেলে-মেয়েরা এদিকে এসে দাঁড়াও। আরে ঐ যে ঠাণ্ডাওয়ালারা। আরে তাড়াতাড়ি এসো। পা চালিয়ে এসো।

বাঁশরী ঃ সবই বিশ্বদার কাছে, হ্যাঁ হ্যাঁ, এখানে চলে এসো। কথা কম। কেন এত কথা বলছ, সীমন্তিনী?

সীমন্তিনী ঃ না, বাঁশরীদি, সীমার কার্ডিগানের বোতাম একটা মিসিং। তাই ও ...

বাঁশরী ঃ ঠিক আছে ওর বোতাম মিসিং। তুমি হুইসপারিং থামাও।

অর্ক ঃ আমাকে একটু এগোতে দাও সীমাদি। কাউকে দেখতে পাচ্ছি না।

মানসপ্রতিম ঃ সত্যিই তো। ঐ বাচ্চা ছেলেটাকে তোমরা সামনের দিকে নিয়ে এসো।

সৌম্য ঃ বাচ্চা কোথায় মানসদা। বেঁটে বলুন। (গলার স্বর নামিয়ে) যাও বিশ্বদার সামনে গিয়ে দাঁড়াও। (ছাত্র-ছাত্রীদের কথাবলা আস্তে আস্তে কমে এল)

মানসপ্রতিম ঃ শোনো সবাই। রওনা হবার আগে আজকে আমরা কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি ওখানে আমরা কিভাবে থাকব, চলব – এসব নিয়ে কয়েকটা কথা বলব। (একটু থেমে) আমি শুধু বলব আমরা সবাই যেখানে যাচ্ছি সেখানে প্রত্যেকে, এমনভাবে চলব যাতে, কোনো ভাবেই কেউ-ই আমাদের কোনো সমালোচনা করতে না পারে। প্রত্যেকটি মিনিট যেন আমরা ব্যবহার করতে পারি ঠিক ঠিক ভাবে। এবার বাঁশরীদি আপনি বলুন।

বাঁশরী ঃ (একটু গলা ঝাড়ার শব্দ) একটা কথা সবাই মনে রাখবে। আগামী সোমবার – মানে ঠিক সাতদিন পরে – প্রত্যেককে আজকের বেড়ানো, আজকের অভিজ্ঞতা, আজ কী দেখলে, কী বুঝলে – সব কিছু নিয়ে একটি 'এসে' বা রচনা আমার কাছে জমা দেবে। সবচাইতে ভালো পাঁচটি আমাদের সামনের মাসের দেওয়াল পত্রিকাতে প্রকাশ করা হবে। ঠিক আছে?

মানসপ্রতিম ঃ এবার বিশ্বদা আপনি একটু বলুন।

বিশ্বরঞ্জন ঃ আমাদের স্কুলের সামনের কিছু জায়গা এক বিল্ডিং থেকে আরেক বিল্ডিং-এ যাবার রাস্তা, ঐ বাগানের চারপাশের রাস্তা ওরকম খোঁড়া খোঁড়া কেন? তোমরা কখনও ভেবেছ এটা? (সবাই চুপ) খোঁড়া খোঁড়া আবার ঘাস লাগানো। কেন?

অর্ক ঃ আমি ভেবেছি সিমেন্টের মধ্যে ঘাস গজিয়েছে সিমেন্ট ফাটিয়ে।

বিশ্বরঞ্জন ঃ চমৎকার। তবে সিমেন্ট ফাটিয়ে নয়। ঘাসকে জন্মাতে দেওয়া হয়েছে। রাস্তা দিয়ে হাঁটাও হল। সবুজ ঘাসও হল। দেখতেও কত সুন্দর হল। তাই না?

(ছাত্র-ছাত্রীরা ঠিক্ ঠিক্ করে উঠল)

বিশ্বরঞ্জন ঃ তা এই ঘাস জন্মাতে দেওয়া কেন? এর সুন্দর হয়ে দেখা দেবার দিকটা অবশ্যই একটা দিক। তবে আরো দিক আছে। আজ ঐ অন্য দিকগুলোও আমরা দেখব। কি ঠিক আছে?

(আবার সবাই বলবে ঠিক ঠিক আছে)

বিশ্বরঞ্জন ঃ তাছাড়া কিছুদিন আগে – তোমরা দেখেছ ঐ দক্ষিণ দিকের বিল্ডিং-এ কয়েকজন মাপ-জোক করছিলেন কি যেন করবার জন্য। ওই মাপ-টাপ নেওয়ার পেছনেও কারণ আছে। আসল কথা, বাড়িকে পরিবেশের সাথে কীভাবে মানিয়ে নিয়ে, পরিবেশকে বাঁচিয়ে তৈরি করা যায় তার ভাবনা, যার প্রয়োগ আমরা আজ দেখব।

অর্ক ঃ ও বাবা তাই? আমি ভাবলাম –

সৌম্য ঃ কেন তুই আবার কি ভাবলি?

বিশ্বরঞ্জন ঃ ঠিক আছে ঠিক আছে সৌম্য। ব্যাপারটা আর একটু এগোলে তোমরা জানতে পারেব।

(মানসপ্রতিম এগিয়ে এসে বিশ্বরঞ্জনকে একটু নিচু গলায় বলে)

মানসপ্রতিম ঃ বিশ্বদা আমি একটু গাড়ি দুটোকে বলে আসি। বিজয় বলেছিল একবার একটু ঝাঁকুনি দিয়ে রাখতে।

বিশ্বরঞ্জন ঃ ঠিক বলেছে। তুমি আর বিজয় দুজনেই গাড়ির তেল, রুট ম্যাপ – এইসব একটু দেখে নাও। পরে বলবে তেল নেহি হ্যয়, লেনে পড়েগা। ওদের আর কি? ঝামেলা বাঁধাতে ওস্তাদ। সামনের বছরের মধ্যে সেনদা একটা নতুন কিছু বুদ্ধি বার করে দেবেন বলেছেন।

বাঁশরী ঃ সেনদা? মানে আপনার সেই যাদবপুরের দাদা?

বিশ্বরঞ্জন ঃ হ্যাঁ সেই সেনদা। উমাশঙ্কর সেন। মেকানিকালের। আমার তিন বছরের সিনিয়ার। প্রোটোটাইপ একটা ফাইনাল হয়ে গেছে।

সৌম্য ঃ কিসের প্রোটোটাইপ বিশ্বদা?

মানসপ্রতিম ঃ হবে, হবে। একদিনে সব বলা হবে না। ইলেকট্রিক বা ব্যাটারীতে চলবে এমন গাড়ি। বাকিটা পরে। (বিশ্বরঞ্জনের দিকে ঘুরে) আমি যাচ্ছি বিশ্বদা ওদিকে। আপনারা এদিকে হয়ে গেলে বাসের কাছে চলে আসুন। (মানসপ্রতিম বাসের কাছে গেল)।

বিশ্বরঞ্জন ঃ হ্যাঁ যা বলছিলাম। আমরা চেষ্টা করছি স্কুলে সবুজ বাড়াবার। আজ তোমরা যেখানে যাবে আর সারাটা দিনই প্রায় কাটাবে, দেখবে কীভাবে – একটা ঢাউস বাড়িতে সবুজ বাড়ানো হচ্ছে।

সীমন্তিনী ঃ সবুজ বাড়ানো হচ্ছে? মানে বাড়ীটাকে সবুজ রঙ করা হচ্ছে বুঝি? আমাদের বাড়ীটা জানেন তো বিশ্বদা ক্যাটকেটে নীল রঙ। বাবা বলে আকাশের রঙের সাথে মিলিয়ে করেছেন।

বিশ্বরঞ্জন ঃ হ্যাঁ যারা যে রঙ করেন তার একটা কারণ দেখান, সুবিধে দেখান। আজ যে সবুজ বাড়ি আমরা দেখব তাদেরও কারণ দেখব, সুবিধে দেখব। শুধু দেখবে না, তোমরা যাচাই করে নেবে তাদের কথা। নইলে মানবে কেন?

(দূর থেকে মানসপ্রতিম ডাকছে)

মানসপ্রতিম ঃ তোমরা সবাই চলে এসো। বাস রেডি।

(দুটো স্কুলের বাসে সবাই যাচ্ছে। রাস্তায় গাড়ীর শব্দ। প্রথম বাসে মানসপ্রতিম ও গোটা পনেরো ছাত্র-ছাত্রী। ছাত্র-ছাত্রীরা ও মানসপ্রতিম গাইছে – ''শীতের হাওয়ায় লাগল মাতন আমলকীর ঐ ডালে ডালে ...।'' গান স্তিমিত হয়ে এল। রাস্তার গাড়ীর শব্দ কমে এল।)

মানসপ্রতিম ঃ বিজয় একটু আস্তে চল। ঐ যে ডানদিকে পার্কটা দেখছিস ঠিক তার পাশের রাস্তা।

সৌম্য ঃ আমরা এসে গেছি মানসদা?

মানসপ্রতিম ঃ আর মিনিট পাঁচ, দশ। সবাই নিজের নিজের ব্যাগ, জলের বোতল, সব গুছিয়ে নাও। (ড্রাইভার বিজয়কে উদ্দেশ্য করে) হ্যাঁরে বিজয় বিশ্বদাদের গাড়ী পেছনে দেখতে পাচ্ছিস তো?

সীমন্তিনী ঃ আমি দেখতে পাচ্ছি। ঐ তো বিশ্বদা সামনের সিটে।

(দুটো গাড়ী এল একটি বিশাল বাড়ির সামনে দাঁড়াল। ব্রেক, হর্ন ইত্যাদির শব্দ কমে একদম বন্ধ। ছাত্র-ছাত্রীদের কলকল একটু একটু করে বেড়েছে।)

মানসপ্রতিম ঃ আমি নীচে নেমে দাঁড়াচ্ছি। সবাই এক এক করে নেমে এসো। ফুটপাতে উঠে দাঁড়াবে। সৌম্য আর সীমন্তিনী এটা দেখো।

(একটু-আধটু কণ্ঠস্বর চলতে থাকবে। দ্বিতীয় গাড়ীর ড্রাইভারের কণ্ঠস্বর – এই বিজয় একটু আগে কর)। সবাই ফুটপাথে দাঁড়িয়ে। বেশ লম্বা এক সুটেড-বুটেড ভদ্রলোক এগিয়ে এসেছেন।)

অমিত ঃ আমি অমিত। অমিত মীরচন্দানী। ওয়েলকাম টু ক্যালকাটাস্ ওয়ান্ডার বিল্ডিং। গ্রীণ বিল্ডিং কমপ্লেক্স্।

মানসপ্রতিম ঃ মাইতি। মানসপ্রতিম মাইতি।

অমিত ঃ আপনি টিচার?

মানসপ্রতিম ঃ ঠিক। আমি স্কুলে পড়াই। এরা সব আমাদের ছাত্র-ছাত্রী আর ....।

অমিত ঃ (মানসের মুখের কথা প্রায় কেড়ে নিয়ে।) বি.আর. সেন কে আচেন আপনাদের সাথে। চিঠিতে লিখলেন যে নিজে আসবেন। (ততক্ষণ বিশ্বরঞ্জন এগিয়ে এসেছেন)

মানসপ্রতিম ঃ বিশ্বদা। বিশ্বরঞ্জন সেন। এই যে উনি। বিশ্বদা ইনি মিঃ মীরচন্দানী।

অমিত ঃ (টেনে টেনে, অবাক হয়ে, খানিকটা যেন কৌতুহলী স্বরে) বিস্‌সোরন্‌জন্‌ সেন। ক্ষমা করবেন, আপনি কি প্রফেসর বি.আর. সেন? যাদবপুরের? সিভিল এনজিনিয়ারিং?

বিশ্বরঞ্জন ঃ হ্যাঁ আমি যাদবপুরে পড়াতাম। আপনি?

অমিত (উচ্ছ্বসিত স্বরে) ঃ আমি চন্দ্রানী স্যার। মীরচন্দানী। আপনি ডাকতেন ঠাট্টা করে চন্দ্রানী। এইট্টি সিক্সের ব্যাচ।

বিশ্বরঞ্জন (টেনে টেনে) ঃ এইট্টি সিক্স। সুজয় চৌধুরী, বাসব দাশগুপ্ত, ইন্দ্রানী রায়, অমিত – ইয়েস অমিত মীরচন্দানী। গোলপার্কের দিকে বাড়ি।

অমিত (প্রণাম করতে এগিয়ে গেল) ঃ পারফেক্ট। একদম ঠিক। এখনো গোলপার্কেই আছি। ও তো আমাদের দাদা-বাবার বাড়ী স্যার। পরণাম স্যার।

বিশ্বরঞ্জন ঃ আরে ঠিক আছে, ঠিক আছে। ভালোই হল। খুব খুশীও হলাম। আগে বলে নিই। এরা আমাদের ছাত্র-ছাত্রী। উনি শিক্ষক মানসপ্রতিম মাইতি। আর এই যে বাঁশরী বসু শিক্ষিকা। এরা দুজনই আজ প্রোগ্রামের দায়িত্বে। (এরপর ছাত্র-ছাত্রীদের দিকে তাকিয়ে) তোমরাও শোনো। ইনি অমিত মীরচন্দানী। আমরা একসাথে যাদবপুরে সিভিল এনজিনিয়ারিং নিয়ে চর্চা করেছি। তা প্রায় কুড়ি পঁচিশ বছর হবে। তাই না চন্দ্রানী।

অমিত ঃ ও স্যার, এবার চন্দ্রানী যাক্‌। অমিত আসুক।

বাঁশরী ঃ হ্যাঁ বিশ্বদা এবার অমিত আসুক। ঐ দেখুন ওদিকে ক্লাস নাইনের চন্দ্রানীকে নিয়ে ওরা ক্ষেপাতে শুরু করেছে।

অমিত ঃ আসলে স্যার, আমার বস্‌ আপনার চিঠিটা আমাকে দেন। দেখেই আমার কেমন যেন সোন্দেহ হল। বস্‌কে বললাম, স্যার এই টিম আমি নিজে কো-অর্ডিনেট করব? তো বস বললেন, ওকে গো এ্যাহেড।

(এবার ছাত্র-ছাত্রীদের দিকে ফিরে)

ওয়েল, আমি অমিত। এই বিশাল বাড়ি, যা কেবল বিশাল বা বড় নয়। এক নতুন ভাওনা, এক নতুন

ডিজাইন, এক কথায় সিভিল এনজিনিয়ারিং-এর ক্ষেত্রে একটা নতুন দিক খুলে দিয়েছে। আজ আমরা সেই নতুন দিকগুলে দেখবো। বোঝবার চেষ্টা করব।

(বিশ্বরঞ্জনের দিকে তাকিয়ে)

স্যার, আমি যেভাবে ভেবেছি সেটা বলছি। প্রথমে আমরা ওই রাস্তার ওপারে বিল্ডিং-এ যাবো। ওটা ক্যান্টিন, এখানে সবাই ব্রেকফাস্ট করব। সব বলা আছে।

বাঁশরী ঃ অমিতবাবু ব্রেকফাস্ট আমাদের সাথে আছে। কেবল একটু বসবার জায়গা ...

অমিত ঃ এটা একটা কথা হ'লো ম্যাডাম! আমার স্যার এসেছেন আজ। ইন্ এ্যানটিসিপেসন আমি ব্যবস্থা করেছি। আর আপনারা বলছেন ...

বিশ্বরঞ্জন ঃ শোনো অমিত, আমি একটা সল্যুশন দিচ্ছি। আমরা যা এনেছি সেগুলো নষ্ট না করে খেয়ে নিই। তুমিও তোমার ব্যবস্থা একটু ছোট করে দাও নাহয়।

অমিত ঃ দ্যাট্স্ গ্রেট। স্যার আমি কেবল দুটো করে বেসন-লাড্ডু দিতে বলি? আপনার মনে আছে?

বিশ্বরঞ্জন ঃ অবশ্যই। কি একটা উপলক্ষে তুমি টেনিস বল সাইজের বেসন-লাড্ডু খাইয়েছিলে একদিন ওয়ার্কশপে।

অমিত ঃ না না, সে তো বাড়িতে তৈরি করা। মা আর নানি করেছিল। আমাদের গুজরাতিদের স্যার সবই ম্যাগনাম সাইজ। ব্যবসা থেকে লাড্ডু – সব বড়া বড়া চাই। এই যে বাড়ীটা ...। থাক্ এখন খেতে খেতে একটু বলব। এখন লেট্স্ প্রসিড।

(সবাই ক্যান্টিনের দিকে এগোলো। সবার মধ্যে একটু কথা হচ্ছে। দরজা খোলার, চেয়ার টানার ও জানালা খোলার শব্দ)

অমিত ঃ সবাই বসে পড়ো একটা করে চেয়ার টেনে। স্যার আপনি এখানে বসুন। (চেয়ার টানাল হালকা শব্দ)।

অমিত ঃ মানসবাবু আমি পাশের ঘরটা একবার দেখে আসি। খাওয়া হয়ে গেলে এ জায়গা আমরা ছেড়ে দেব। পাশের ঘরে বসব।

মানসপ্রতিম ঃ ঠিক আছে মিস্টার মীরচন্দানী।

অমিত ঃ নো মোর মিস্টার মীরচন্দানী। অমিত, অন্লি অমিত। ওকে?

(অমিত পাশের ঘরে গেল)

বাঁশরী ঃ সৌম্য, সীমন্তিনী, সুজয়, সোহিনী – তোমরা টিফিন সার্ভ করো। একটু হাত চালিয়ে।

(টিফিনের বাক্স, কার্টুনের কাগজ খোলা – এসবের শব্দ। সবাই নীচু গলায় কথা বলতে বলতে খাচ্ছে।)

বাঁশরী ঃ মানসদা আপনিও বসে পড়ুন।

মানসপ্রতিম ঃ ঠিক আছে এখানেই বসছি।

বিশ্বরঞ্জন ঃ ড্রাইভাররা চারজন আছে। ওটা খেয়াল রেখো মানস।

বাঁশরী ঃ আপনি ভাববেন না। ওদের জন্য আলাদা প্যাক করে আনা হয়েছে। বিজয়কে আমি দিয়েও দিয়েছি।

(অমিত ফিরে এল।)

অমিত ঃ আই অ্যাম সরি ফ্রেন্ডস্। লাড্ডু বানাতে একটু দেরি করে ফেলেছে। নেভার মাইণ্ড। ও ঘরে আমরা একটা ছোট্ট মিট করে নেব। তখন লাড্ডু এসে যাবে। লাড্ডু প্লাস আইসব্রেকিং – একসাথে চলবে।

সোহিনী ঃ (নীচু স্বরে) বাঁশরীদি, আইসব্রেকিং কি? এই ঠাণ্ডায় আবার আইসক্রীম খাওয়াবে? আমি কিন্তু আইসক্রীম খাবো না। আমার গলা ...।

বাঁশরী ঃ (সোহিনীকে থামিয়ে) আস্তে আস্তে বল। আইসব্রেকিং মানে প্রাথমিক পরিচয় করা। সবার মধ্যেই নতুন লোক, নতুন জায়গায় একটু জড়তা থাকে। সেই জড়তা কাটানোকেই বলে আইসব্রেকিং। এখন হাত চালিয়ে খেয়ে নাও।

(সবাই খাওয়াতে ব্যস্ত। একটা গুণগুণ গোছের শব্দ)

অমিত ঃ সবার হয়েছে? আমরা কি এবার পাশের ঘরে যেতে পারি? (হঠাৎ নজরে পড়লো, তাই বলে উঠল) না না, বিস্কিট, কেক – এসবের র‍্যাপারগুলো আলাদা বিনে ফেলতে হবে। কলার খোসা, ডিমের খোলস – ওগুলো আলাদা বিনে। আমরা কোনো কিছুই ফেলি না। ক্যান্টিনেও না, অফিসেও না। রিসাইকেল করি, রি ইউজ করি।

বিশ্বরঞ্জন ঃ চমৎকার। চমৎকার অমিত। আমি ঠিক জায়গায় আজ এসেছি।

(আবার চেয়ার টেবিল সরানো, হালকা করে জুতো পায়ে হাঁটার, বোতল থেকে জল নেবার শব্দ, অর্থাৎ ক্যান্টিনে যে রকম শব্দ হয়।)

(মিউজিক)

(সবাই ক্যান্টিনের পাশের ঘরে গুছিয়ে বসেছে। ঘরটি জনা চল্লিশের আলোচনা বা সভা গোছের কিছুর জন্য ব্যবহৃত হয়।)

বিশ্বরঞ্জন ঃ তোমরা অনেকেই খেয়াল করেছ এ জায়গাটা ঠিক অফিস পাড়ার মত না। সাজানো গুছোনো। তার সাথে শান্ত। গাড়ী ঘোড়ার হৈ হট্টগোল নেই। সব খোলামেলা, অথচ ঠান্ডা খুব একটা লাগছে না।

অমিত ঃ আমাদের এই বিল্ডিং কমপ্লেক্সে হর্ণ দেওয়া বারণ। অবশ্য দেবার প্রয়োজনও হয় না।

বিশ্বরঞ্জন ঃ তাই বলো। হ্যাঁ যা বলছিলাম। আমাদের স্কুলের রাস্তা, বাগান, গাছপালা তোমাদের খুব চেনা। আমি আশা করব এখানে তোমাদের পরিচিত কি কি আছে তা তোমরা খুঁজে দেখবে। এবার অমিত, তোমার কিছু বলবার আছে?

অমিত ঃ আমি স্যার অল্প দু-চারটে কথা বলব। এটা আমরা সবাইকেই বলি। নিজেরাও মানি। এক নম্বর – তোমাদের ফিল্ড ওয়ার্ক-বুক আর পেন আছে সাথে?

(সমস্বরে সবাই বলে হ্যাঁ, হ্যাঁ)

অমিত ঃ ভেরি গুড। খাতায় তোমরা তোমাদের মতো করে নোট নেবে। (দরজার দিকে তাকিয়ে ক্যান্টিনবয়কে বলে) আইয়ে, অন্দর চলে আইয়ে ঔর হর টেবিল পর বাট দিজিয়ে। শান্তিসে দেনা। হড়বড় না করনা। (তারপর ছাত্র-ছাত্রীদের বলবে) আমরা পারতপক্ষে কাঁচের বা প্লাস্টিকের বা ষ্টীলের প্লেট ব্যবহার করি না। এখানেও না, অফিসেও না।

বাঁশরী ঃ এগুলো কি দিয়ে তৈরি? কী সুন্দর!

অমিত ঃ ম্যাডাম চিনতে পারলেন না?

বাঁশরী ঃ (আমতা আমতা করে) ঠিক বুঝতে পারছি না।

বিশ্বরঞ্জন ঃ সুপারী গাছের ডাল। খোল বলাই ঠিক। কি তাই তো?

অমিত ঃ একদম পাক্কা স্যার।

সৌম্য ঃ আমরা এই বাটিগুলো নিয়ে যাবো বাঁশরীদি?

বাঁশরী ঃ লাড্ডু সহ?

(সবাই হেসে উঠল)

সৌম্য ঃ (অপ্রতিভস্বরে) না, না, লাড্ডু দুটো খেয়ে বাটি মুছে নেব।

অমিত ঃ নো প্রবলেম। নিয়ে নাও। এখন আরেকটা কথা বলি। ঐ যে জানালা দিয়ে সব্‌জে কাঁচের বিল্ডিং দেখা যাচ্ছে, ক্যান ইউ টেল মি ইট্‌স্ নেম।

(সবাই চুপ। কেবল মানসপ্রতিম বলল।)

মানসপ্রতিম ঃ নাম বলতে পারব না। তবে এটা বলতে পারি – এ ধরনের বাড়ী আমাদের দেশে হাতে গোনা

কয়েকটি হয়েছে।

বিশ্বরঞ্জন ঃ বসুন্ধরা। ঠিক বললাম অমিত?

অমিত ঃ কারেক্ট স্যার। আপনি জানবেন না তা হয় না।

বিশ্বরঞ্জন ঃ এই বিশাল কাজ, ডিজাইন কাদের করা?

অমিত ঃ (বেশ গর্বের সাথে) কে আবার আমরাই। মিঃ রাজাগোপালন অবশ্যই ওয়ান অফ দি ফার্সট ফোর। আরো তিনজন আর্কিটেক্ট আছেন। এঁরাই থিংক ট্যাঙ্ক। তবে, আমি এই ক'বছরে যা দেখলাম এমন কাউকেই নেওয়া হয় না যে পরিবেশ নিয়ে ভাবে না বা একটা স্পেশাল এ্যাপটিচুড যার না আছে।

বাঁশরী ঃ তাঁরা তো সবাই একই সিলেবাস পড়ে, একই পরিবেশ থেকে আসছে!

অমিত ঃ অবশ্যই। কিন্তু ঐ যে কোম্পানীর মিশন। প্রত্যেককে, সিনিয়র থেকে জুনিয়ার – প্রত্যেক ট্রেডের, যেই তুমি হও না কেন, এক মাস ইনডাকশন ট্রেনিং নিতে হবে। একটা আইসব্রেকিং ড্রিলের মধ্য দিয়ে আসতে হবে।

সোহিনী ঃ ওরে বাবা সব জায়গায় আইসক্রীম।

(সবাই হেসে উঠল)

অমিত ঃ তবে একটা পার্সোনাল কথা। কলকাতায় আমরা তিন জেনারেশন হল। রিয়েল এস্টেট মানে বাড়িঘর তৈরি করা আর সেল করা আমাদের পরিবারের বিজনেস। তবুও সব কথা আমি বাংলাতে বলতে পারবো না। মাঝে মধ্যেই ইংরেজীতে বলব।

বিশ্বরঞ্জন ঃ আরে তা নিয়ে তোমার ভাবনা নেই। ছেলে-মেয়েরা নোটতো নিচ্ছে। পরে আমরা একটা রিভিউ মিট করবো। গো এ্যাহেড।

অমিত ঃ তা হ'ল কি আমরা ক্লাইমেট চেঞ্জ নিয়ে অনেক কথা শুনি, বলি। সব সাবজেক্ট ডিসিপ্লিন এটা নিয়ে ভাবছে, কথা বলছে। সবার চিন্তা এনভায়রনমেন্ট বা পরিবেশ যেন নষ্ট না হয়। ভালো করতে হবে ঠিক আছে? কম করে খারাপ যেন না করে ফেলি। ঠিক তো?

সীমন্তিনী ঃ আমাদের আসামে গ্রামের বাড়িতে ...

(কথা শেষ হবার আগেই অর্ক বলল)

অর্ক ঃ ব্যস মানসদা সীমন্তিনী আসামে যাবে এবার।

সীমন্তিনী ঃ তা তো বলবেই তোমরা। জানো না কিছু। সবটাতে কুটনী দেবে। জানো আমাদের বাড়ি কিভাবে

বানানো হয়?

অমিত ঃ রাইট ইউ আর ম্যাম্। কেবল আসাম নয়, এনটায়ার নর্থ-ইস্টে বাড়ি তৈরিতে একটা স্পেশাল ডিজাইন আছে। ওয়ারমেশ বা লোহার জালের দু'পাশে কাদা সিমেন্ট দিয়ে কাঠের ব্লক করে বাড়ির দেওয়াল করা হয়। ঠিক একই প্রিন্সিপল্। এখানেও এডপট্ করেছি।

সোহিনী ঃ বাড়ির ডিজাইন আপনি করেছেন বোধ হয়?

অমিত ঃ ওহ্ গড, নো নো। (বিশ্বরঞ্জনকে দেখিয়ে) এই স্যারের কাছে যাদবপুরে চার/পাঁচ বছর বহুত পড়েশনের পর তখন পরিবারের ব্যবসাতে আছি। হঠাৎই একটা সুযোগ এসে গেল।

মানসপ্রতিম ঃ এই বাড়ির ডিজাইনার আর্কিটেক্ট ডাক পাঠালো?

অমিত ঃ না, ডাক দিলো ঠিক না। আমার নানা মানে দাদু একবার দিল্লী থেকে ফিরছেন। প্লেনে আলাপ হ'ল মিঃ রাজাগোপালন নামে এক ভদ্রলোকের সাথে। একথা-ওকথা হতে হতে আমার কথা উঠল। যাদবপুর শুনেই রাজাগোপালন সাহেব নানাকে বলেন আমার সাথে পার্ক হোটেলে দেখা করতে বলবেন।

বিশ্বরঞ্জন ঃ রাজাগোপালন? পুরু গোঁফ আছে? ওয়েল বিল্ট?

অমিত ঃ এগ্জাকট্লি! আপনি চেনেন?

বিশ্বরঞ্জন ঃ ঠিক চিনি তা বলব না। ভাইজ্যাগে একটা কনফারেন্সে মিট করেছি। রূড়কির পাস আউট।

অমিত ঃ ইয়েস্ স্যার। তো এই রাজাগোপালন সাহেব আমাকে অফার দিলেন ওর সাথে জয়েন করবার। আমিও ব্যাগেজ-বিস্তারা নিয়ে প্রথমে বছর দুই দিল্লী, পরে এখানে সাইট অফিসে জুটে গেলাম।

মানসপ্রতিম ঃ অমিতদা – এই সম্বোধন ঠিক অছে তো? – একটা কথা। আপনাদের এখানকার বিল্ডিং-এর সাইডওয়াক গায়ের অনেকটা করে জায়গাতে গোটা গোটা সিমেন্টের জাল বিছানো। আর সেই গোটাগুলোতে ঘাস জন্মেছে। আমাদের স্কুলেও বিশ্বদা এটা করিয়েছেন।

অমিত ঃ করবেনই তো ভাই। একই প্রিন্সিপল্। ঐ ঘাসের জায়গাগুলো দিয়ে প্রচুর বৃষ্টির জল মাটিতে যাচ্ছে। জল রি-চার্জ হচ্ছে নীচের লেয়ারে। পরিবেশ ঠাণ্ডাও থাকছে। ভালো কথা, বাড়ীটা কত উঁচু মনে হচ্ছে?

সীমন্তিনী ঃ আমাদের কামাখ্যার মন্দির না প্রায় ....

সৌম্য ঃ আবার আসাম! (সবাই হো হো করে হেসে উঠল) জানেন স্যার, জানেন স্যার, আসামের ডেঙ্গী মশা কামড়ালেও নাকি ডেঙ্গী জ্বর হয় না। এতো ভালো সব মশারা।

(সবাই হো হো করে হেসে উঠল। কেবল সীমন্তিনী কাঁদো কাঁদো সুরে বলল, বাঁশরীদি ...)

মানসপ্রতিম ঃ ঠিক আছে, ঠিক আছে। সবাই চুপ। (সবাই চুপ করল) বলুন অমিতদা –

অমিত ঃ বাড়ীর মাপ জোক নেবার আগে আরও দুটো দশটা কথা আমি বলব। তোমরা জানো আমরা সবাই শহরের জীবনে কেমন যেন হাঁফিয়ে উঠছি, তা কলকাতা-ই বলো আর দিল্লীই বলো, চেন্নাই বলো আর মুম্বাই বলো।

বিশ্বরঞ্জন ঃ ইঁট, সিমেন্টের খাঁচা সর্বত্র। আমার ছোটবেলার শান্তিনিকেতনও। ....., এমনকি পাঠভবনেও যখন পড়েছি, তখনও পুরো বিশ্বভারতী কত সবুজ ছিল। বোলপুর, জামবনী এরিয়া, শ্রীনিকেতন – নাঃ, কিছুই আর খালি নেই।

অমিত ঃ স্যার আমার এখনও মনে আছে ক্লাসে আপনি গো গ্রীন, গো গ্রীন স্লোগানে বিশ্বাস রাখতে বলতেন।

বাঁশরী ঃ পরিবেশ নিয়ে গত দশ পনেরো বছরে কিন্তু সব দেশে কিছুটা আলোড়ন হয়েছে। এখনও হচ্ছে।

অমিত ঃ হচ্ছে। তবে তুলনায় কম। আরো জোরদার হতে হবে। আমাদের এগ্‌জিসটেন্‌সের জন্যই প্রয়োজন। যা নেচারের কাছে আমরা পাই তো এমনভাবে একসপ্লয়েট করছি তাতে আর চলবে না। এই না-চলাটা এখন পৃথিবীতে অনেক মানুষকে ভাবাচ্ছে।

মানসপ্রতিম ঃ এই ভাবনা থেকেই গ্রীণ বিল্ডিং?

অমিত ঃ ঠিক তাই। এই ভাবনাটাই শুরু করল। আর এই নেচারের সাথে মানিয়ে থাকা, একটা টেঁকসই পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে নেচার থেকে উপকরণ এক্‌সট্রাক্ট করা – এ থেকেই এলো গ্রীণ বিল্ডিং বিষয়ে ভাবনা। কেবল কলকাতায় নয়, আমার জানা আছে ভারতে কম করে পাঁচ-ছ'টা গ্রীণ বিল্ডিং বা কমপ্লেক্স, এমন কি হায়দ্রাবাদে একটা এয়ারপোর্ট বানাতেও এই কনসেপ্ট কাজে লাগানো হয়েছে।

সৌম্য ঃ হ্যাঁ হ্যাঁ, গত ছুটিতে আমরা জেঠুর বাড়ী বেড়াতে গিয়ে রাজীব গান্ধী ইন্টার ন্যাশনালের গল্প শুনেছিলাম। ওখানেও এই ব্যাপার?

বাঁশরী ঃ কিন্তু সিমেন্ট, ইঁট, বালি – এগুলো কিভাবে এড়াবেন? এদের তাড়াতে গেলে তো আপনাকে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে।

অমিত ঃ অফ কোর্স। এইযে বিশতলা বাড়ী বসুন্ধরা, একে দাঁড় করাতে তো হয়েছে। প্রায় ছ'লাখ স্কোয়ার ফিট এরিয়াকে ডেভেলপ করতে হোলো, প্রায় তিরিশ হাজার স্কোয়ার ফিট কার্পেট এরিয়া, আরো পরে ফ্লোর প্লাস, এত বড় বাড়িতে আলোর, জলের ব্যবস্থা।

মানসপ্রতিম ঃ ভাবা যায় না। এর সাথে ওপরে ওঠা-নামার ব্যবস্থা।

অমিত ঃ একটা বিশাল, বিশাল ব্যাপার। আর প্রত্যেকটা বিশাল ব্যাপারকে এনভিরনমেনটাল ফ্রেন্ডলি কনসেপ্ট্ অনুযায়ী বাঁধতে হবে। যেমন ধর বৃষ্টির জল। মোটামুটি জুন মাসের থার্ড উইক থেকে শুরু করে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত – প্রায় একশ দিনের মধ্যে সত্তর দিন মতো ঐ পুরো বিল্ডিং এবং ছাতে যত জল পড়ে তার একটি বুঁদ, মানে ফোঁটা আমরা নষ্ট করি না। সব জমা করে পরিষ্কার করে ব্যবহার করি।

বিশ্বরঞ্জন ঃ আমাদের স্কুলেও ছোটমত ব্যবস্থা করেছি। তাছাড়া একটা মাটির নীচে জল পাঠাবার ছোটখাটো পরিকল্পনাও আছে।

অমিত ঃ একসেলেন্ট স্যার। এখানেও দুটো রেনওয়াটার সেকেন্ড লেয়ারে রিচার্জ করবার ব্যবস্থা আছে। এমনকি ব্যবহার করা জলও পিউরিফাই করে ...।

সোহিনী ঃ এমা। বাথরুম, ক্যান্টিন, ওয়াশরুমের জল ব্যবহার! এ্যা মাগো।

অমিত ঃ নো 'এ মাগো ম্যাম'। ঐ জল আমরা বাড়ির পেছনে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টে নিয়ে নানা মেডিসিন, পিউরিফায়ার দিয়ে পরিস্কার করি। তবে হ্যাঁ তোমাদের মতো এ ম্যাগোর জন্য সেই জল আমরা খাই না। বাগানও আমাদের বিশাল এরিয়া জুড়ে। এই বিশাল বাগানের জন্য যত জল লাগে সবটাই আসে ঐভাবে।

বাঁশরী ঃ কিন্তু খোলা জায়গাতেও তো জল পড়ে। তার বেলা?

অমিত ঃ সেটার ব্যবস্থা আছে। খেয়াল করে দেখবেন আমরা পীচের বা কংক্রীটের রাস্তা করি না। সারফেসের জল যাতে মাটি শুষে নিতে পারে তার সুযোগ আছে। ড্রেনেজ সিস্টেম নিখুঁত। আমাদের এরিয়ার জল বাইরে যায় না। ভেতরেই হয় জমা হয়ে কাজে লাগে, না হলে মাটিতে ঢুকিয়ে দিই যতটা পারি।

বাঁশরী ঃ কিন্তু এত অফিস, এতো লোক। তাদের কাজের জায়গা, তাদের নিজের নিজের নানান জিনিষের ব্যবহার?

অমিত ঃ কিছু প্রবলেম তো অবশ্যই হয়। যেমন, পুরো বিল্ডিং-এর মেইনটেনেন্স আমাদের হাতে। সে আপনি ফ্লোর কিনেই থাকুন, কি ভাড়া নিয়েই থাকুন। প্লাসটিকের তৈরি জিনিষ ব্যবহার খুব কম। যেটুকু হয় তার কেয়ারফুল ডিসপোজাল সিস্টেম আছে। সবাইকে তো মানতে হয়।

মানসপ্রতিম ঃ তা আপনাদের সুপুরীর ডোগা থেকে তৈরি বাটি থেকেই মালুম।

বিশ্বরঞ্জন ঃ তোমরা হেম্প ক্রেট, স্ট্রবেল ব্যবহার করে দেখেছ?

অমিত ঃ করা হয়েছে স্যার। ফ্লাই অ্যাশ থেকে তৈরি হলো ব্রিকস্-এর কাজ। অনেকটাই করা হল। বিল্ডিং-এর পেছনে নর্থ সাইডে দেখবেন। মেইনটেনেন্স স্টাফের জন্য কিছু কোয়াটার আছে। ওখানে স্ট্রবেল

ব্যবহার করেছি। ভালো কথা, কে যেন আসামের কথা বলছিলে? ইয়েস ইউ ম্যাম। স্টাফেদের এই বাড়ি – দেখলে তোমার আসামের বাড়ির কথা মনে পড়বে। আনেকটাই একই পদ্ধতি আছে।

অর্ক ঃ এতো বড় বাড়ি। আগুন লাগলে?

মানসপ্রতিম ঃ লাগতেই পারে। শত সাবধান হলেও সাবধানের যেমন মার নেই, মারেরও সাবধান নেই অমিতদা। তাই না?

অমিত ঃ অফ কোর্স। প্রত্যেকটা ফ্লোরে প্রত্যেক দিকে স্পেশাল এমারজেন্সী এন্ট্রান্স আছে আগুন মোকাবেলার জন্য। প্রতিমাসে রেলিজিয়াস্‌লি ফায়ার ড্রিল হয় একদিন না জানিয়ে।

বিশ্বরঞ্জন ঃ দ্যাটস্ গুড।

অমিত ঃ আরো একটা জিনিসের কথা স্যার বলেছেন। হেম্প ক্রেট। তো হেম্প জানো। কী হবে? নিশ্চয়ই জানা আছে?

সোহিনী ঃ কেন শণ। দড়ি তৈরি হয়। বলে, শণের দড়ি।

অমিত ঃ ঠিক। আর ক্রেট কী হল? একটা ঝুড়ি। এখানে শণের তৈরি ঝুড়ি। শণের মতো চুন সিমেন্টের সাথে মিলেজুলে বানানা এক একটা ব্লক। খুব শক্ত, খুব হালকাও বটে।

সৌম্য ঃ কখনো দেখিনি অমিতদা।

অমিত ঃ খুব একটা ব্যবহার নিজের নিজের বাড়ি বানাতে আমরা এখনও করি না। বাট, গ্রীন বিল্ডিং কনসেপ্ট এইসব মেটেরিয়ালের জন্ম দিল।

শিবশঙ্কর ঃ তোমরা কি নিজেরাই বানিয়ে নিলে?

অমিত ঃ ইয়েস স্যার। আরো একটা বিখ্যাত ক্রেট। মোটামুটি একইরকম। এটাতে সডাস্ট মানে কাঠের গুঁড়ো ব্যবহার হচ্ছে। বসুন্ধরাতে তোমরা হেম্পক্রেট অপর টিম্বারক্রেটের ব্যবহার দেখবে। বাট আমি বলব না কোথায়। যে দুটো ফ্লোরে আমরা যাব তার দুটোতেই আছে। তোমরা বলবে কোথায় লাগানো হল। ওকে?

সোহিনী ঃ আচ্ছা অমিতদা দেখছি, ঠিক ধরতে পারছি না এখান থেকে, পুরো বাড়িটার প্রত্যেক ফ্লোরে গাছ ঝুলছে।

অমিত ঃ গুড অবজারভেশন ম্যাম। ওটা আমার আর এক কলিগের ব্রেনচাইল্ড। গৌহাটিতে আর দার্জিলিং-এ দেখে আইডিয়া এল।

অর্ক ঃ গেল রে, আবার আসাম। বাঁশরীদি সোহিনী মনে হয় এখানে আগে কাজ করতো!

(সবাই হেসে উঠল)

অমিত ঃ ওই দুটো শহরে দেখলাম — দার্জিলিং-এ প্রায় সব বাড়িতে, গৌহাটিতে বামুনি ময়দান নামে একটা এরিয়াতে দু-তিনটে বাড়িতে — জানলাতে প্ল্যাসটিকের — কি বলব — হ্যাঁ হ্যাঁ ঠোঙাতে ফুলগাছ বসানো।

বাঁশরী ঃ (স্বর একটু উঁচু করে) ধরে ফেলেছি, ধরে ফেলেছি। সব ফুলগাছ ওই হেম্পক্রেট বা টিম্বারক্রেট থেকে এসেছে। কি ঠিক বলেছি?

অমিত ঃ পারফেক্ট ম্যাডাম। তবে অনেকটা রিকনস্ট্রাক্ট করতে হল। রুড়কি ইঞ্জিনিয়ারিং খুব হেল্প করলো। কলকাতায় এমন আইডিয়া আমাদের প্রথম। পিটুনিয়া, টুয়েলভ-ও-ক্লক, ক্যালেন্ডুলা এমন সব হালকা-ফুলকো ফুলের গাছে গোটা বসুন্ধরা আমরা প্রায় ঢেকে দিলাম। সুন্দর হল আর ইকোফ্রেন্ডলি হয়ে গেল।

বাঁশরী ঃ অমিতদা ফুলের গাছের শখ আমারও আছে। কত পরিশ্রম হয়েছে এই বিশাল বিল্ডিং-এ তা আমি বুঝি।

অমিত ঃ আরেকটা মজার খর দিয়ে রাখি। গ্রিন বিল্ডিং-এর কনসেপ্টে বাড়ি বানাবার মাল-মশলা যত দূর সম্ভব ইকোফ্রেন্ডলি হবে তা ঠিক। তা বলে ইঞ্জিনিয়ারিং প্যারামিটার, নিয়ম তা পুরোপুরি মানতে হবে।

মানসপ্রতিম ঃ ওরে বাবা তা না হলে তো বাড়িই ধপাস্। সব গ্রিন থেকে রেড হয়ে যাবে।

অমিত ঃ আলবত। তো আমরা মেটেরিয়াল কম করে দিলাম। নতুন ভাবনা এল মাথায়। (শিবশঙ্করবাবুর দিকে তাকিয়ে) স্যার ওই সময় বোসসাহেবের সাথে আমার পরিচয় হল। শিবপুরের পাস আউট। আর্কিটেক্ট। নিজের ফার্ম ছিল। বসুন্ধরা মেইন বিল্ডিং-এর পেছনে দেখবেন একটা পাঁচতলা বিল্ডিং আছে। ইনফ্যাক্ট ওটাতেই আমার অফিস আছে। ওর সবকটা সিলিং ঢালাই হল বোসসাহেবের কাছে শেখা মেথড থেকে।

শিবশঙ্কর ঃ বাঁশের চাটিই বা মাদুর? বোসের মাথা থেকেই বার হয়েছিল।

বাঁশরী ঃ ওরে বাবা এই বোসসাহেবও আপনার পরিচিত।

অমিত ঃ (খুব অবাক হয়ে) স্ট্রেঞ্জ! হ্যাঁ বাঁশের চাটাই আর ম্যাট পেতে তার ওপরে ঢালাই হল। প্লাস্টিক শিটের ওপর ম্যাট। তার ওপর ঢালাই।

মানসপ্রতিম ঃ কিন্তু বাঁশের চাটাই বা মাদুর বা পাটি যাই-ই হোক তা তো ঢালাইয়ের খরচ বাড়িয়ে দিল।

অমিত ঃ তা দিল। তবে সিলিং, একটা সিলিংও যে প্লাস্টার করলাম না। ম্যাট খুলে — ছিঁড়ে ফেলে দিলেই হল।

একটা ডিজাইন হয়ে গেল পুরো সিলিং-এ সেটা? প্লাস্টারের খরচ বাঁচলো!

সৌম্য ঃ (লাফিয়ে উঠল প্রায়) ধরে ফেলেছি, ধরে ফেলেছি। অমিতদা ক্যাচ কট কট। এই যে আমাদের মাথার ওপরে সবাই দেখো।

অমিত ঃ ইয়েস বয়, অমিতদা কট অ্যান্ড বোল্ড। এই বিল্ডিংটাতেই আমরা প্রথম এক্সপেরিমেন্ট করেছিলাম। তাই সিলিং অমন ডিজাইনদার। নো প্লাস্টারিং। কেবল রং করা হল।

(সবাই হাততালি দিয়ে উঠল)

অমিত ঃ ওয়েল ফ্রেন্ডস্। সবুজ বাড়ী বা ঠিকভাবে বললে পরিবেশ বা এনভায়রণমেন্ট ফ্রেন্ডলি বিল্ডিং সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা আশা করি আমাদের হ'ল। ঠিক তো? নাউ লেট আস হ্যাভ এ কাপ অফ টি। তারপর আমরা বের হবো। দেড়টার মধ্যে আমরা ফিরে আসতে পারব আশা করি।

মানসদা আর বাঁশরীদি দুটো গ্রুপ মতো করে নেবেন, লিড করবেন। হ্যাঁ একটা কথা। আজ সবাইকে, তার মধ্যে আমিও থাকছি, লাঞ্চ আমি খাওয়াবো। বাট নিরামিষ লাঞ্চ।

বিশ্বরঞ্জন ঃ আরে না না। আমরা তো রেডি হয়ে এসেছি। দু'টোর মধ্যে ফিরে লাঞ্চ স্কুলে। ব্যবস্থা করা আছে চন্দানী।

মানসপ্রতিম ঃ একদম ভাববেন না অমিতদা। বিশ্বদার নিখুঁত প্ল্যানিং।

অমিত ঃ (একটু গম্ভীর ইমোশনাল গলায়) স্যার, আপনি মেনে নিন আজ। আমার জীবনে আজ একটা স্পেশাল দিন আছে) ধরে নিন, এটা আমার গুরু দক্ষিণা।

(একটুকু করুণ সুর বেজেই থামবে। সবাই চুপ। একটা স্তব্ধ ভাব কয়েক সেকেন্ড। একসাথে হৈ হৈ করে উঠল তারপর।)

অমিত ঃ না না, আমিও একটা জিনিষ চাইছি। আমাকে একটা গান শোনাতে হবে। তারপর চা।

মানসপ্রতিম ঃ অবশ্যই। (একটু গলার স্বর উঁচু করে) সবাই ধরো। ওয়ান টু ...

শীতের হাওয়ায় লাগল মাতন ...

(সমবেত সবাই, খুব উচ্চ কণ্ঠে নয়, তবে বেশ দরদ দিয়ে গানটি ধরবে। প্রথম দুই লাইন গাইবার সাথে সাথে গান ফেড আউট করবে)।

সমাপ্ত